‘এরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড’

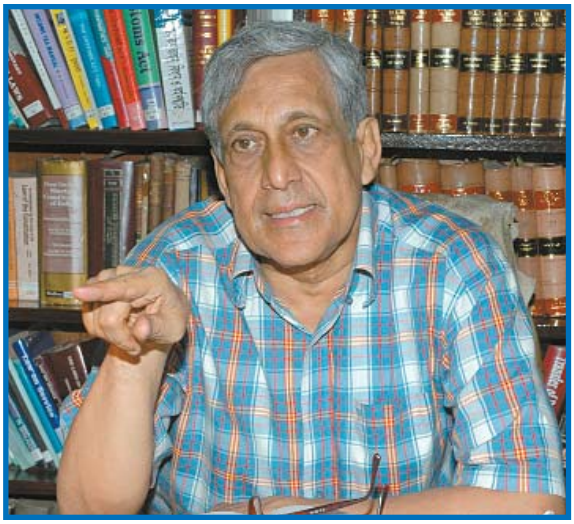

ড. এম জহির
আইন বিশেষজ্ঞ

বহু অপেক্ষার পর অবশেষে শীর্ষ জঙ্গি নেতা শায়খ রহমান এবং বাংলাভাই ধরা পড়েছে র‍্যাবের হাতে। শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। চলছে বিচারের প্রক্রিয়া। বিচারে তাদের শাস্তি কি হতে পারে সেটা নিয়ে জনমনে রয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। তাদের সম্ভাব্য শাস্তি এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ মুখোমুখি হয়েছিল বিশিষ্ট আইনবিদ ড. এম জহিরের। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আরিফ খান মিরণ** এবং **শামীম সুফী**

সাপ্তাহিক ২০০০ : সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশে কী কী আইন আছে?

ড. এম জহির : ১৯৯২ সালে বিএনপির প্রথম দফা শাসনামলে সন্ত্রাস দমনে একটি আইন করা হয়েছিল, পরবর্তীতে সেটা বাতিল করে আওয়ামী লীগ জননিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করে।

২০০০ : সেটাও তো বাতিল করা হলো?

ড. জহির : হ্যাঁ, বিএনপি দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে জননিরাপত্তা আইন বাতিল করে, তার বদলে দ্রুত বিচার আইন প্রণয়ন করে। বর্তমানে সন্ত্রাস দমনে এই আইনটিই বলবৎ আছে।

২০০০ : কিন্তু দ্রুত বিচার আইন তো বিচারকে দ্রুত করার জন্য। এটা তো পদ্ধতিগত আইন।

ড. জহির : এটা পদ্ধতিগত আইন সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এই আইনেই আবার বলে দেওয়া হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে এ আইনটি প্রযোজ্য হবে। সাধারণভাবে সন্ত্রাস বলতে আমরা যা বুঝি যেমন- চাঁদাবাজি, গাড়ি ভাঙচুর ইত্যাদি অপরাধের নাম উল্লেখ করে তাদের দ্রুত বিচারের কথা বলা হয়েছে। সেই অর্থে এটাকে শুধু পদ্ধতিগত আইন বললে ভুল বলা হবে। তবে আইনটির সমস্যা হচ্ছে, খুন-ডাকাতির মতো মারাত্মক অপরাধের দ্রুত বিচারের কোনো বিধান এতে রাখা হয়নি। এটা একটা বড় দুর্বলতা।

২০০০ : শায়খ, বাংলা ভাইদের বিচারের জন্য বাংলাদেশে শক্ত কোনো আইন আছে কি, বা দ্রুত বিচার আইনে তাদের বিচার করা যায় কি?

ড. জহির : আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে শুধু এতটুকু বলি- বাংলাদেশে অবশ্যই সে ধরনের শক্ত আইন আছে। তবে যদি দ্রুত বিচার আইনে তাদের বিচার করতে হয়, তাহলে আইনটিকে বদলাতে হবে। তারা যেটা করছে সেটা ‘ওয়েজিং ওয়ার এগেইনস্ট দ্য স্টেট’। দ্রুত বিচার আইনে এ ধরনের অপরাধের বিচার করার কোনো বিধান রাখা হয়নি। কিন্তু আইন বদলালেই কি সব হয়? আইনের কাটাছেঁড়ার চাইতে বেশি দরকার আইনের প্রয়োগ। আপনি যদি ঠিকমতো আইন প্রয়োগ করতে না পারেন বা আপনার যদি সেই সদিচ্ছা না থাকে, তাহলে আইন বদলিয়ে লাভ কী? এমনিতে আমাদের দেশে যেসব আইন আছে, বিচার নিশ্চিত করার জন্য সেগুলো যথেষ্ট। আমাদের অভাব হচ্ছে আইন প্রয়োগের ইচ্ছার।

২০০০ : স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ‘রাষ্ট্রদ্রোহিতার’ মামলা করা হবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

ড. জহির : সেটাও করা যায়। সে ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি বা দণ্ডবিধি অনুসারে মামলা করতে হবে। তবে আমার কথা হচ্ছে, এরা যা করছে তা শুধু রাষ্ট্রদ্রোহ নয়, রাষ্ট্রদ্রোহের চাইতে বেশি কিছু। এরা তো আসলে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

২০০০ : আপনি কি মনে করেন দণ্ডবিধি বা ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে মামলা করে জঙ্গিদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব?

ড. জহির : দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় যদি এদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয়, তাহলে আর তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি কীভাবে হবে? এই ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। যদি আপনি ১২১ ধারায় অভিযোগ আনেন, কেবল তখনই তাদের মৃত্যুদণ্ড হবার সম্ভাবনা থাকে। তাদের বিরুদ্ধে ১২১ ধারায় অভিযোগ আনার মতো সব রকম উপাদানই আছে। এরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ১২১ ধারায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অথবা যুদ্ধের প্রচেষ্টা চালায় অথবা যুদ্ধে উসকানি দেয়, সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে। ওবায়দুল্লাহ মজুমদার বনাম রাষ্ট্র (৩৪ ডিএলআর ৪০৪) মামলায় বলা হয়েছে, ১২১ ধারায় কাউকে দণ্ডিত করতে হলে প্রমাণ করতে হবে- অভিযুক্ত সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বৈধ সরকারকে আইন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এসব ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্ট্র যদি ১২১ ধারায় মামলা করে তাহলে জঙ্গিদের সর্বোচ্চ শাস্তি হবে না কেন? ইংরেজরা তো এই ধারাতেই ফেলে অনেককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। তারপরে যদি এদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৯ ধারায় অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে মামলা করেন, তাহলেও শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

২০০০ : কিন্তু পাকিস্তান আমলে তো এই ১২১ ধারার অধীনে বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কাউকে দণ্ড দেয়া যায়নি।

ড. জহির : কীভাবে দেবে? পাকিস্তানই তো উড়ে গেল। জনগণ ছিল তখনকার কথিত ‘রাষ্ট্রদ্রোহীদের’ পক্ষে। আপামর জনসাধারণ যে

মানুষের পক্ষে, তার বিরুদ্ধে আপনি আইন দিয়ে কী করবেন? আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন আর এখন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা তো এক বিষয় নয়। দেশের মানুষের আবেগ, অনুভূতি এদের বিরুদ্ধে। তাই এদের বিরুদ্ধে বিচার খুব ভালোভাবেই করা সম্ভব।

২০০০ : কিন্তু দ্রুত বিচার আইন ছাড়া প্রচলিত আইনে তো বিচারের জন্য অনেক সময় লেগে যাবে।

ড. জহির : সে জন্যই তো বলেছি, 'দ্রুত বিচার' আইনটার দ্রুত পরিবর্তন দরকার। আইন পরিবর্তন করতে তো খুব বেশি সময় লাগে না। সংসদে সরকারের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। আইনমন্ত্রী চাইলেই এ ব্যাপারে বিল আনতে পারেন।

২০০০ : দ্রুত বিচার আইনকে বদলিয়ে নতুন কী কী বিধি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

ড. জহির : দ্রুতবিচার আইনে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ, চাঁদা তোলা, ভয় দেখানো, যানবাহনের ক্ষতিসাধন করা ইত্যাদি অপরাধের কথা বলা হয়েছে। এর সাথে সাথে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, মার্ডার এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ইত্যাদি অপরাধকেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২০০০ : আরো একটি ১৭ আগস্ট রুখতে পরিবর্তিত দ্রুতবিচার আইনই কি যথেষ্ট?

ড. জহির : ইংরেজরা বহু আগে এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তাদের প্রণয়নকৃত আইনেই এখনো দেশ চলছে। ইংরেজরা যে আইনগুলো করে গেছে সেগুলো যথেষ্ট কড়া। ওদের দূরদর্শিতা ছিল। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও শক্ত ছিল। আমি এটা মানি না যে, আরো একটা ১৭ আগস্ট রুখতে আমাদের ৫০টি নতুন আইন করতে হবে। আমার কথা হচ্ছে, দ্রুত বিচার আইনে যদি আপনি জঙ্গিদের বিচার করতে চান তাহলে আইনটি বদলাতে হবে।

২০০০ : বিএনপি প্রথমে করল 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন' আওয়ামী আমলে সেটা বাতিল করে করা হলো 'জননিরাপত্তা আইন'। বিএনপি আবার ক্ষমতায় এসে 'জননিরাপত্তা আইন' বাতিল করে করল 'দ্রুত বিচার আইন'। এই যে এক সরকার এসে আরেক সরকার প্রণীত আইন বাতিল করে নতুন আইন করছে, এর পেছনের কারণ কী?

ড. জহির : তারা হয়তো মনে করছে নতুন আইন করলে আরো ভালো হবে। এতে কিছুটা বাহবার ব্যাপারও আছে। নিজেরা কিছুটা বাহাদুরি পাওয়ার জন্য এসব আইন করে থাকে। এর পেছনে কিছুটা হয়তো যুক্তিসঙ্গত কারণও থাকে। কিন্তু আমার কথা হলো, আইন করে কিছু হবে না। দেখার ব্যাপার হলো, আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কি না। সেটাই আসল। আপনি কাকে, কত জনকে ধরবেন; কীভাবে তাদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করবেন এবং তারপর চার্জশিট কীভাবে দেবেন- এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিচারের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়াও দরকার। সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। এর মধ্যে বিচার হলে হবে, না হলে বিচারের দরকার নেই। আমাদের দেশে সমস্যা তো এখানেই। এ ব্যাপারে উকিলদেরও দোষ আছে।

২০০০ : উকিলদের কী কী দোষ?

ড. জহির : উকিলরা খামোখা সময় ক্ষেপণ করে। যেটা পাঁচ মিনিটে বলার কথা, সেটা পাঁচ ঘন্টায় বলে। অনেক সময় মক্কেলদের সামনে বাহাদুরি ফলানোর জন্য তারা এমনটা করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিচারকদের কথাও আমি বলব। সন্দেহ নেই অনেকেই যোগ্য বিচারক আছেন। কিন্তু এটাও আপনাকে মানতে হবে, আমাদের দেশে অদক্ষ বিচারকের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

২০০০ : জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই মুহূর্তে আমাদের হাতে দণ্ডবিধি ও বিশেষ ক্ষমতা আইন আছে। এই দুটি আইনের আওতায় সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞাটা কী?

ড. জহির : জঙ্গিরা যা করছে সেটাকে আপনারা সন্ত্রাস বলছেন কেন? এটা তো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। রাষ্ট্রদ্রোহিতা। সন্ত্রাস হলো ডাকাতি করা, রাহাজানি করা, জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। ইট ইজ নট সন্ত্রাস। তারা বলছে আইন মানি না, সংবিধান, সংসদ মানি না, বিচার ব্যবস্থা মানি না। এটাকে কেন সন্ত্রাস বলবেন?

২০০০ : মুক্তাগাছায় বাংলা ভাই ধরা পড়ার পর বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, অস্ত্র আইন ও পুলিশের ওপর আক্রমণ করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। আপনি কি মনে করেন এসব আইনে মামলা করে তার অপরাধটাকে লঘু করার চেষ্টা করা হয়েছে?

ড. জহির : অবশ্যই। এদের একটা আইনেও মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই। আমি নিজে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলি। আমার মনে হয় শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ভীষণ অমানবিক। মানবাধিকারের লঙ্ঘনও বটে। কিন্তু যারা এই ধরনের অপরাধী, ক্রমাগত মানুষ হত্যাকারী, যাদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই, তাদের বাঁচিয়ে রাখাও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এ জন্যই তদন্ত হওয়া দরকার। এরা কি কাজ করেছে তার কিছু আমরা জানি। তবে বেশির ভাগটাই জানি না। এই না জানা কথাগুলো জানতে হবে। তাই মামলা করার আগে আমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলো বিস্তারিত তদন্ত বা অনুসন্ধান। সব তথ্য উদঘাটন করে তার পরে মামলা করা প্রয়োজন।

২০০০ : এর আগে নয়?

ড. জহির : ডেফিনেটলি নট। ঠিকমত তদন্ত করা হলে আরো কত কী বের হবে তার কোনো ঠিক নেই। আগে সব তথ্য বের করা দরকার। কোনো রকম করে একটা মামলা করলেই তো হলো না।

২০০০ : কিন্তু মামলা না করে আটকে রাখবে কী করে?

ড. জহির : না, তা বলছি না। মামলা তো করতেই হবে। তবে সবকিছুর তদন্ত হওয়াও দরকার। কেউ বলছে ৮০০ জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছে, কেউ বলছে ৩ হাজার। এসব বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত।

২০০০ : যারা জঙ্গি কর্মকাণ্ডের পেছনে অর্থের যোগান দিয়েছে, তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর উপায় কী?

ড. জহির : এদের বিরুদ্ধেও ১২১ ধারায় মামলা করা যায়। কেননা, অপরাধে সহায়তা সংক্রান্ত দণ্ডবিধির ১০৭/১০৮ ধারা এদের বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য।

২০০০ : মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বলেছিলেন- বাংলা ভাই বলে কিছু নেই, এসব মিডিয়ার সৃষ্টি। একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তির কি কোনো আইনি প্রতিকার নেই?

ড. জহির : আইনি প্রতিকার হয়তো নেই, তবে দেশের লোক বুঝেছে তিনি কেমন বুদ্ধিমান! এমন মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, জঙ্গিবাদ সম্বন্ধে সত্য উদ্‌ঘাটনে তাদের অনাগ্রহ আছে। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, ওরা স্বীকার করেছে ওরা হুমায়ুন আজাদকে মেরেছে, ময়মনসিংহে বোমা মেরেছে। কিন্তু ২১ আগস্ট নিয়ে কেউ কেন কিছু বলছে না!

২০০০ : আপনি বলতে চাচ্ছেন, ২১ আগস্ট নিয়ে কেন ওদের কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে না?

ড. জহির : হচ্ছে কি হচ্ছে না তা আমি জানি না। তবে এখন সত্য বের করার সময় এসেছে। ২১ আগস্টের হামলার পর গঠিত একটি কমিশনে আমিও ছিলাম। কিন্তু আমরা কেউ বুঝতে পারিনি কারা এ কাজ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন থেকে আমরা যে কমিটি করেছিলাম, তখন আমরাও জেএমবির কথা কিছুই জানতাম না।

২০০০ : কমিশনে কাজ করে আপনি/আপনারা কী ফলাফল পেলেন?

ড. জহির : পরিষ্কার কিছু পাইনি। তবে বুঝতে পেরেছিলাম যে মৌলবাদীদের কেউ এ কাজ করেছে। কিন্তু কারা, কোন দল- তার উত্তর পাওয়া যায়নি। কারণ আমি ধরে নিয়েছিলাম, মৌলবাদী দলগুলো যেহেতু বিএনপির সঙ্গে আছে, সেহেতু তারা এ কাজ করবে না। এখন বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপার ভিন্ন। তবে এটা ঠিক যে, বিএনপি জোট সরকারের কাছ থেকে তারা সিমপ্যাথি পেয়েছে সর্বহারা নিধনের নামে।

২০০০ : দ্রুত বিচার আইন সংশোধন ছাড়া এ জাতীয় রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্ম রোধ করার জন্য আর কোনো নতুন আইনের প্রয়োজন নেই বলেই আপনি মনে করেন?

ড. জহির : না, নতুন আইনের দরকার নেই। প্রচলিত আইনের সঠিক প্রয়োগই যথেষ্ট।

২০০০ : মৌলবাদ বা জঙ্গিবাদ রুখতে আর কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ড. জহির : এখন তো বাংলাদেশ একটা সত্যিকারের মৌলবাদী দেশে পরিণত হয়েছে। এর আগে নিউজ উইকে বেরিয়েছিল। আমরা কান দিইনি। বলেছি, এগুলো বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্র। আমাদের দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধিতা না করেই আমি বলতে পারি, এর পেছনে

অপরিপুষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষাই দায়ী। মাদ্রাসা শিক্ষার সংশোধন দরকার। এটা করা গেলে জঙ্গিবাদ রোখা সম্ভব হবে।

২০০০ : মাদ্রাসা শিক্ষার কী ধরনের সংশোধন দরকার?

ড. জহির : এটার আধুনিকায়ন করতে হবে। এক দেশে দুই শিক্ষানীতি-ব্যাপারটাই ঠিক নয়। তার ওপর শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি হয় পুরনো, সেকেলে, তাহলে তার ফলাফল কী হতে পারে সেটা তো আমরা চোখের সামনেই দেখছি। কলকাতায়ও ইসলামী মাদ্রাসা আছে। সেখানে তো সব ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াশোনা হয়। আমাদের ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ সাহেব কত বড় মানুষ ছিলেন। তিনিও কিন্তু ঐ মাদ্রাসার ছাত্রই ছিলেন।

২০০০ : এখানেও মাদ্রাসায় ইংরেজি পড়ানো হয়...

ড. জহির : খুবই কম।

২০০০ : আমরা জানি শায়খ রহমান ও বাংলা ভাই সরাসরি কোন অপারেশনে ছিল না। এমন কোনো সম্ভাবনা কি আছে যে এজন্য তারা সর্বোচ্চ শাস্তি এড়াতে পারবে?

ড. জহির : না, এসব কোনো অজুহাত না। আইনে যে খুন করে এবং যে খুন করায় দুজনের জন্যই সমান দণ্ড। এমনও বিধান আছে, যে খুন করছে সে হয়তো না বুঝে খুন করছে। তাই তার দণ্ড মওকুফ হবে। কিন্তু যে বুঝেশুনে খুন করালো তার নিস্তার নেই। আইন তার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তিই বরাদ্দ করে।

২০০০ : ১৪ দল প্রণীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আপনার মন্তব্য কী?

ড. জহির : বেগম জিয়া একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। দুই দলই আসুক, বসুক, আলোচনা করুক। কিন্তু বিরোধী দল একেবারে নাকচ করে দিল। এ রকম করলে তো হয় না। হবে না। গণতন্ত্র চলে যাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা প্রথম থেকেই আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। বলেছি, ভারত যেভাবে নির্বাচন করে, সেভাবে কর। নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দাও। এটাকে স্বাধীন করো। না, তা না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। দ্য হোল আইডিয়া ইজ রং। তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানে কী? মানে হলো, সব রাজনৈতিক দল মিলে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ। কী লজ্জার কথা! নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করে দিয়েই দেখুন না। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

২০০০ : নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতার জন্য আপনি কী প্রস্তাব করছেন?

ড. জহির : প্রথমেই সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আলাদা করতে হবে। নিরপেক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকেও ঢেলে সাজাতে হবে। বিতর্কের তো কোনো অবকাশ নেই। আমি আগেও বলেছি, নির্বাচন কমিশন থেকে যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা করছে তাদের সাথে বিএনপি-আওয়ামী লীগের একজন করে থাকুক। দেখুক ঠিকমতো ভোটার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে কি না। ভোটার তালিকা নতুন-পুরনো এগুলো আসলে ফালতু বিতর্ক।

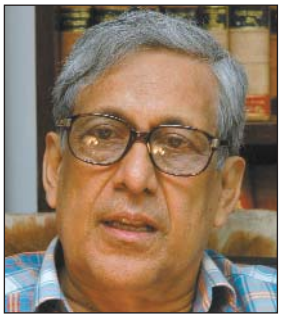

আমার মনে হয় শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ভীষণ অমানবিক। মানবাধিকারের লঙ্ঘনও বটে। কিন্তু যারা এই ধরনের অপরাধী, ক্রমাগত মানুষ হত্যাকারী, যাদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই, তাদের বাঁচিয়ে রাখাও সমাজের জন্য ক্ষতিকর

২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্বাচনের জন্য একটি মানদণ্ড আছে। নির্বাচন কমিশনের প্রধান কে হবেন সেটি নির্ধারণের ব্যাপারে মানদণ্ড কী?

ড. জহির : অন্তত এ রকম একজন ব্যক্তি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হবেন, যিনি এত ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়বেন না। একজন সক্ষম ব্যক্তি চাই।

২০০০ : সরকারি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সর্বজন গ্রহণযোগ্য একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করা হবে। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

ড. জহির : সবাই মিলে কীভাবে একমত হবে এটা আমি বুঝি না। অনেক মানুষ হলে অনেক মত হবে এটাই স্বাভাবিক। বাঙালির জন্য একমত হওয়া আরো বেশি অসম্ভব। মনে করুন, আওয়ামী লীগ বলল আমরা খালেদা জিয়াকে প্রধান উপদেষ্টা বানাতে চাই। আল্লাহর কুদরতে কত কিছুই তো হতে পারে। আমার ভয় হয়, তখন বিএনপিই হয়তো বলে বসবে- না আমরা মানি না। এতো শুদ্ধবাদী হওয়া সম্ভব নয়। নোবডি ইজ নিউট্রাল। প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দ থাকে। কিন্তু তার মানে এই না যে, সে কর্মক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকবে না।

২০০০ : হাইকোর্টের বিচারকদের যেভাবে দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে, তাতে বিচার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা আছে কি?

ড. জহির : এর ফলাফল এই বিচারকগণ যখন সিনিয়র হবেন তখন বুঝবেন।

২০০০ : এই প্রবণতা রোধ করার উপায়?

ড. জহির : আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছাড়া উপায় নেই।

২০০০ : রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক এককভাবে বিচারক নিয়োগে যেহেতু দলবাজি হচ্ছে, সেহেতু বিচারক নিয়োগে কোনো কাউন্সিল গঠন করা উচিত নয় কি?

ড. জহির : সেভাবে কাউন্সিল করার দরকার নেই। আমরা বহুবার বলেছি, বারের নেতা যারা আছেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়োগ দিন। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। প্রত্যেকটা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দূষিত করে রাখা হয়েছে। কোথায় ব্যাঙ্গালোর, কোথায় হায়দ্রাবাদ-চেন্নাই- ওরা কম্পিউটার টেকনোলজিতে কোথায় এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা রাজনীতি করছি, রাজনীতি করছি আর রাজনীতি করছি।

২০০০ : বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ নিয়ে যে টানাহেঁচড়া চলছে, এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

ড. জহির : বললেই কি আর বিচার বিভাগ পৃথক হয়ে যায়? আগে বিচারকদের চিন্তাধারা বদলাতে হবে। যখন কেউ বলে 'হুজুর সরকারের এত টাকা লোকসান'- সঙ্গে সঙ্গে দেখি কোর্টের চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। আমার বাবাও বিচারক ছিলেন, তখনো এ সমস্যা ছিল। সরকারের প্রতি দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

২০০০ : এর সমাধান কী?

ড. জহির : যত অ্যাডভান্সড রাষ্ট্র হবে, তত তারা সরকারকে সহায়তা করার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসবে। আমেরিকা, ইংল্যান্ডে তো বিচারকরা সরকারকে পাত্তাই দেয় না। সরকারি উকিলদেরও দোষ আছে। তারা ফাঁক রেখে কাজ করে। তবে পৃথকীকরণের আসল কাজটা ইশতিয়াক সাহেব যখন উপদেষ্টা ছিলেন, তখন প্রায় করেই ফেলেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেষ করে যেতে পারেননি। এখন প্রতিটি সরকারই বলে বিচার বিভাগ পৃথক করবে, কিন্তু করে না। আইনমন্ত্রী একবার বলেন, জুন মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। আবার বলেন, ২০১২ সাল পর্যন্ত লাগবে। কথার কোনো আগা-মাথা নেই।

২০০০ : কিন্তু সবার ইশতেহারেই তো থাকে যে তারা বিচার বিভাগ পৃথক করবে।

ড. জহির : করে তো না। খালি সময় প্রার্থনার খেলা খেলে। এটা হচ্ছে রাজনৈতিক অসততা।

২০০০ : পৃথকীকরণ প্রসঙ্গে কয়েকজন সচিব যে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন, এর শেষ হবে কীভাবে?

ড. জহির : ভালোই হয়েছে। এখন তারা বলুক কার নির্দেশে আদালতের রায় কাটাছেঁড়া করেছেন। তাদের পেছনে আর কোন কোন বড় মাছ আছে, সে সব কথা। আমরা দেখি বিচার বিভাগ নিয়ে এই দীর্ঘসূত্রতার পেছনে দায়ী করা।

২০০০ : এতে করে কি শাসন বিভাগ আর বিচার বিভাগের মধ্যে একটা টানাপোড়েন তৈরি হবে না?

ড. জহির : না, কীসের টানাপড়েন। বিচার বিভাগ হলো সংবিধানের অভিভাবক। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় সব কাজই বিচার বিভাগ করবে। এতে সংঘাত বা টানাপোড়েনের কী আছে?

ছবি : **সালাহ্ উদ্দিন টিটো**